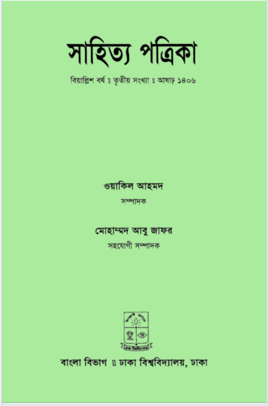

Vol. 42 | No. 3 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল-চেতনালোক ও তাঁর কিশোর সাহিত্যের পরিমণ্ডল

Volume	42
Issue	3
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	June 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i3.1
Pages	7-30
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুল-চেতনালোক ও তাঁর কিশোর সাহিত্যের পরিমণ্ডল

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ*

অতুলনীয় জীবনবৈচিত্র্য ও বিপুল সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা কবিতার ধারায় একটি নবতর স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন। নজরুল ইসলাম সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কৈশোরেই লেটোর দলের গান বেঁধে। তবে তাঁর ধারাবাহিক সাহিত্য-জীবনের শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে কলকাতায় আসার পর থেকে। ১৯৪২ সাল নাগাদ কবি অসুস্থ হয়ে পড়লে এর সমাপ্তি ঘটে, যদিও তিনি বেঁচেছিলেন আরও প্রায় ৩৫ বছর। তাই সার্বিক বিবেচনায় নজরুলের সাহিত্যজীবন মূলত ঐ দুই যুগেরই। নজরুল তাঁর কৈশোরে যখন সিয়ারসোল স্কুলের ছাত্র তখন একটি চড়ুইছানার দুঃখ দেখে 'চড়ুই পাখীর ছানা' কবিতাটি লিখেছিলেন। এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত লেখার ধারাটি অব্যাহত ছিল নজরুলের সমস্ত জীবন জুড়ে। ফলে মাত্র দুই যুগে তিনি যা লিখেছিলেন তা গুণে ও পরিমাণে অতুলনীয়।

নজরুলের প্রধান পরিচয় তিনি 'বিদ্রোহী'। সৌরমণ্ডল, পৃথিবী ও ভূতলের সবকিছুকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে চেয়েছেন এমন পরিচয়েই তিনি জনপ্রিয়। তবে এই ধ্বংস শুধু নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার জন্য নয়; বরং এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল - অন্যায়ের অবসান ও অত্যাচারীর শাস্তিবিধান; 'প্রলয়-মাতম' তার কাছে চিরদিনই ছিল 'সৃজন-বেদন'। পাশাপাশি এই বিদ্রোহের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। আপাতবিচারে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও সেটি ছিল বিশ্বে যুদ্ধের অবসান। 'ক্ষত্রিয়'দেরকে যুদ্ধবাদীর প্রতীক হিসেবে এঁকেছেন তিনি। পরশুরামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়ে বলেছেন :

> নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার! (বিদ্রোহী)

অথচ নজরুলকে আমরা শান্তিবাদী হিসেবে কদাচ উপস্থাপন করি।

নজরুলের বিদ্রোহের পেছনে যে কারণটি সুপ্ত তার মধ্যে কোনো প্রতিহিংসা, প্রতিশোধপরায়ণতা বা আশাহতের ক্রোধ নেই। বরং মানুষের প্রতি ভালোবাসার

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

উল্লেখ করা যায়, বাংলা সাহিত্যের আসরে নজরুলের পূর্ণ আত্মপ্রকাশের কয়েক বছর পূর্বেই ঘটে গেছে দুনিয়া কাঁপানো রুশ বিপ্লব। ভারতবর্ষেও কমিউনিস্ট আদর্শ এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশ ঘটেছে । 'জনতার সাহিত্য' 'প্রলেতারিয়েতের জন্য শিল্প', 'শ্রমজীবীর জন্য সাহিত্য' প্রভৃতি তত্ত্বালোচনাও ছড়িয়ে পড়েছে বঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে । কিন্তু নজরুলের 'বিদ্রোহ' বইয়ের তত্ত্বের অনুকরণে বুলি আওড়ানো নয়; বরং তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা ও অন্তরের অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশমাত্র ।

নজরুলের আত্মস্বীকৃতিমূলক রচনায় দুটি বিষয় স্পষ্ট । প্রথম, নজরুল নিজেকে মনে করেন সমকালের কবি – সমকালের অন্যায়-অত্যাচারের অবসান তাঁর রচনার উদ্দেশ্য । এই অত্যাচারিতের আবার দু'টি রূপ ছিল । এর একটি ব্রিটিশ শাসকচক্র যারা এদেশকে পরাধীনতার শেকল পরিয়ে রেখেছে । ফলে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে নজরুলের দ্বন্দ্ব হয়েছে বারংবার । বন্দি করা হয়েছে তাঁকে । তাঁর সাতটি গ্রন্থ বাজেয়াফত করা হয়েছে—১৯২২-এ *যুগবাণী*, ১৯২৪-এ *বিশের বাঁশী* ও *ভাঙার গান*, ১৯২৬-এ *দুর্দিনের যাত্রী*, ১৯৩০-এ *প্রলয়-শিখা* ও *চন্দ্রবিন্দু* এবং সবশেষে *রুদ্রমঙ্গল* । তাঁর কাছে অত্যাচারীর আর একটি রূপ ছিল সেসকল 'সবল' যারা দুর্বলের ওপর অন্যায় করে অথবা যারা মানুষে মানুষে অসাম্য সৃষ্টি বা মানবতার অপমান করে । সেজন্যে তাঁর রচনায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে মেহনতী মানুষ বা কায়িক শ্রমিকের প্রতি অবজ্ঞার বিরুদ্ধে অথবা ধর্মের নামে বঞ্চনার বিরুদ্ধে । দ্বিতীয় যে কথাটি তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন সেটি হলো, কাব্য লিখে অমর হওয়ার সাধনা তাঁর নয় – সে গৌরব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্যে । যুগের প্রয়োজন মেটাতে পারলেই তাঁর কাব্যসাধনা সার্থক হবে ।

।। দুই ।।

নজরুল-মানস ও তাঁর চেতনালোক সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় নজরুলকে খণ্ডিত করে উপস্থাপনার প্রবণতা। বিশের দশকে তাঁর অসামান্য পাঠকপ্রিয়তার সময় থেকেই এর শুরু । যাঁর যাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুলকে উপস্থাপনা করা, সাম্প্রদায়িক অথবা অন্যান্য নেতিবাচক দৃষ্টিতে নজরুলকে আপন স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা, প্রভৃতির ফলে সমগ্র বাঙালি জাতির নানা অংশের মধ্যে নজরুলকে খণ্ড খণ্ড করে দেখার একটা ধারার সৃষ্টি হয়, যদিও নজরুল আপনার বিপুল বৈচিত্র্য নিয়ে এ'সবের ঊর্ধ্বেই থেকে গেছেন । সকল অর্থেই গতিশীল নজরুলকে তাঁর সুস্থাবস্থায় কোনো বন্ধনে দীর্ঘসময় আবদ্ধ করে রাখা যায়নি ।

জীবিত অবস্থাতেই কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালির একজন সাংস্কৃতিক বীর-এ রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । রাষ্ট্রীয় বিভক্তির মধ্যেও সকল বাংলাভাষী অন্তত একটি উত্তরাধিকারের দাবি ছাড়তে রাজি হয় নি, সেটি নজরুল-

উত্তরাধিকার। সাম্প্রদায়িক শক্তি এরও অপব্যবহার করতে চেয়েছিল ভুল উপস্থাপনার মাধ্যমে। এই ভ্রান্ত উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে যে-কয়েকটি ধারণাকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা ছিল, তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে নজরুল ইসলাম মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের জাতীয় কবি।

নজরুল ইসলামি-পুনর্জাগরণের পক্ষে বেশ কিছু গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন, এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তাঁর এই 'ইসলাম' ছিল প্যান-ইসলামি আন্দোলনের ভাবধারায় পুষ্ট; তাঁর বীর ছিলেন কামাল পাশা, আনোয়ার পাশারা। কোনোক্রমেই একে 'পাকিস্তানবাদ'-এর পক্ষে বলা সঙ্গত হবে না। রাজনীতির সঙ্গে নজরুলের যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল, তিরিশের দশকেও তা মুসলিম লীগের ভাবধারা বা কাঠামো থেকে অনেক দূরবর্তী। বরং তাঁর যোগ ছিল কমিউনিস্ট, কংগ্রেসি ও কৃষক, প্রজা পার্টির ভাবধারার সঙ্গে। তাঁর সাংবাদিক-জীবনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। তৎকালীন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পক্ষে যে প্রতিবাদ নজরুলের মধ্যে দেখা যায়, তা দুর্বলের প্রতি সবলের অন্যায়ের প্রতিবাদেরই অংশ; কোনো সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নয়।

ভ্রান্ত উপস্থাপনার দ্বিতীয় অংশটি ছিল আরও সুপরিকল্পিত। এতে নজরুল ইসলামকে ব্যবহার করা হতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপরীত-*ইমেজ* হিসাবে। বলা বাহুল্য, এটা ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

তৃতীয় একটি ব্যাপারও ছিল। মানুষের প্রতি, সর্বহারার প্রতি নজরুলের ভালবাসার পিছনে যে কমিউনিস্ট ভাবধারার একটি বড় অবদান ছিল, তা অত্যন্ত সুকৌশলে চেপে যাওয়া হতো। বরং অনেক সময় এর সঙ্গে যুক্ত করা হতো 'ইসলামি-সাম্যবাদ'কে।

নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার একটা চুম্বক-বিশ্লেষণ পাওয়া যায় বাংলা একাডেমী প্রকাশিত *নজরুল রচনাবলীর* সম্পাদক আবদুল কাদিরের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ :

> নজরুলের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও আর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চেয়েছিলেন; তার পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন সন্ত্রাসবাদ – কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে আহবান করেছিলেন; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়মতান্ত্রিকতা – কারণ তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন; কেউ ভেবেছেন প্যান-ইসলামিজম্ – কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন; আবার কেউ ভেবেছেন মহাত্মা গান্ধীর চরকা-তত্ত্ব – কারণ তিনি গান্ধীজীকে তাঁর রচিত 'চরকার গান' শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এ-সব ভাবনার কোনোটাই সত্যের

সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সহায় নয় । প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল-পন্থী—কামাল আতাতুর্কের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ । ১৩২৯ সালের ৩০ শে আশ্বিন তারিখের ১ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যক 'ধুমকেতু'তে তিনি 'কামাল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন। ''সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল'' যে, 'খিলাফত উদ্ধার' ও 'দেশ উদ্ধার' করতে হলে ''হায়দারী হাঁক হাঁকা চাই; .... ও-সব ভণ্ডামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না । ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার ।'' কামাল আতাতুর্কের প্রবল দেশপ্রেম, মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও উদার মানবিকতা নজরুলের এই যুগের রচনায় প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল।

এবং

ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজ্‌মের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী' 'সর্বহারা' ও 'ফণিমনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট । তাঁর 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার'-চরিত্র এই আদর্শবাদের আলোকে বিকশিত ।

কিন্তু সেদিন কবি প্রবল আবেগ নিয়ে দেশের গণ-আন্দোলনের পুরোধায়ী চারণ হয়েছিলেন, তা'তে ভাটা পড়লো দুটি কারণে । প্রথম কারণ : ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ২রা এপ্রিল শুক্রবার থেকে কলকাতায় রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত । দ্বিতীয় কারণ : ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কংগ্রেস কর্মী-সংঘের সদস্যদের উদ্যোগে 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' নাকচ করে প্রস্তাব গ্রহণ। নজরুল কৃষ্ণনগর সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' গেয়ে, কিন্তু কাণ্ডারিদের কানে তাঁর আবেদন পৌঁছলো না । অগত্যা নজরুল আত্মরতির সন্ধান করলেন, 'মাধবী-প্রলাপ' ও 'অনামিকা'র রোমান্টিক রূপ-জালে-ক্রমে আত্মমগ্ন হলেন 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'-এর সুর-লোকে । কিন্তু সেই রূপ ও সুরের মোহন মায়াজাল ভেদ করেও বারবার তাঁর কানে বেজেছে নিপীড়িত মানবতার কাতর আর্তনাদ; তিনি নিরাসক্ত শিল্পীর আনন্দময় আসন ছেড়ে এসে' রুদ্র কণ্ঠে গেয়েছেন 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু'র বেতনার্ত গাথা-গান ।

'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার' একস্থানে বলেছেন; ''নীড়হারাদের সাথী আমি । ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে, পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই । . . . আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে'' এই আনসারের কণ্ঠে সেদিন পরোক্ষে ফুটেছে নজরুলেরই অন্তরের বাণী । বস্তুত তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে তাঁর রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর সাহিত্যধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হয় ।

এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় গোপাল হালদারের বক্তব্য :

> He is no intellectual and has never pretended to be one. With him the heart is all that matters: it is the guide and test of his poetry. Emotion with all its glow, sincerity in all its simple charm, and an almost unlimited quantity of vitality and vigour have made Nazrul unique and admirable to his readers and the common man.
>
> By nature and conviction, Nazrul is a people's poet and believed, all through his writing career, that 'art is for the people', even though he did not possibly know this dictum of Lenin. He emphatically stated more than once that he did not mean to write merely for the elite but made as he was, he could not help being moved by the objective conditions and the human situation around. His unaffected imagination and inventiveness, his command over rhetoric or his wit and fancy might at times have broken loose, much to the detriment of the requirements of art. But his spontaneity and passionate abandon have always been marked by a complete sincerity. . . . . A masculinity in the body of his poetry, and intensity of passion and vigour, and inventiveness in diction, a capacity for successful fusion of the Persian-Arabic and Sanskrit-Bengali words into the body of his creative writing, etc. etc. His love has many subtle moods, ranging from the sensual to the spiritual. His poetry has a passionate involvement with his country, with the common man, and with the Hindu-Muslim unity. Moreover, his poetry stands for all that is True and Beautiful in human nature, for international brotherhood and for the rights of man. All these and much more make Nazrul 'the second poet' in this great age of Bengali letters.
> (দ্র. *Kazi Nazrul Islam*. দ্র. ৭৫-৭৬)

নজরুল চেতনালোকের মূল প্রবণতাসমূহকে আমরা নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করছি :

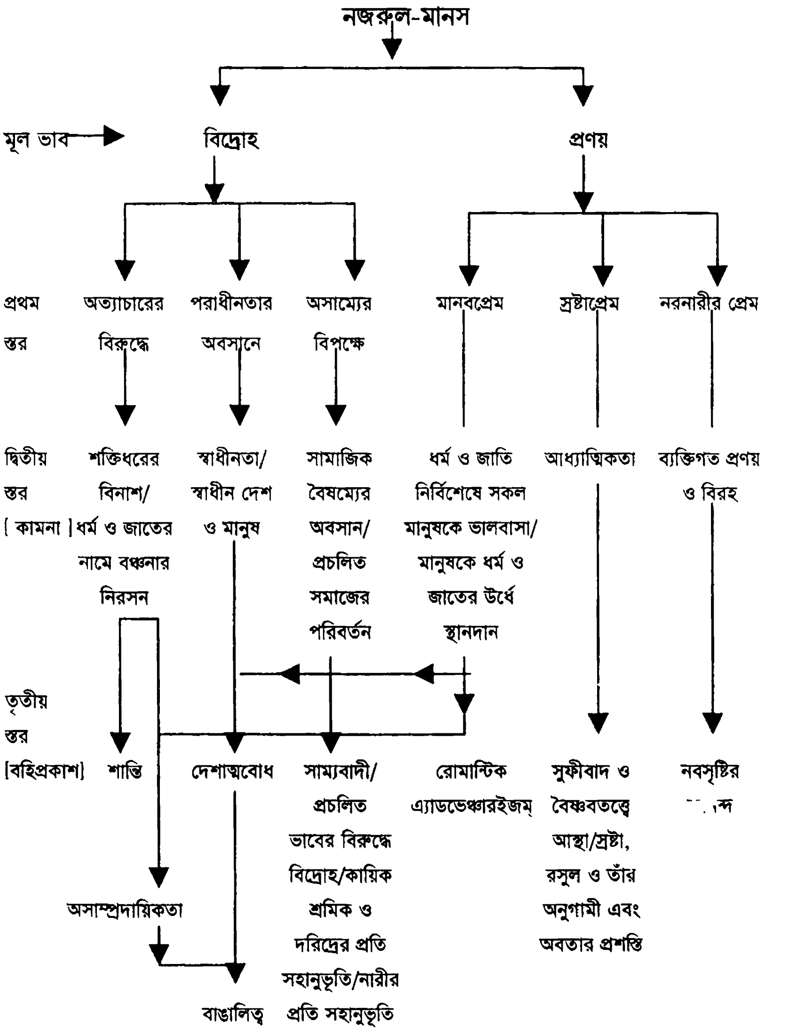

।। তিন ।।

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনীকে (*সওগাত*-১৩২৬) প্রথম মুদ্রিত রচনা ধরলে ১৯৪২'এ কলকাতা বেতার কেন্দ্রে তাঁর অসুস্থতার প্রথম প্রকাশ পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলামের সক্রিয় শিল্পীজীবনের মেয়াদ দাঁড়ায় মাত্র ২৪ বছর। মাত্র দু'টি যুগে নজরুল যে সৃষ্টিসম্ভার পাঠকদের জন্য রেখে গেছেন, তা' আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য; চূড়ান্ত বিচারে বিস্ময়কর। কয়েক বছর আগে নজরুল ইনস্টিটিউট নজরুল গ্রন্থপঞ্জী ও নজরুল-বিষয়ক গ্রন্থাবলীর যে তালিকা প্রকাশ করেছে, সে-অনুযায়ী নজরুল-সৃষ্টিসম্ভারের রূপরেখা এরকম দাঁড়ায় :

কাব্য গ্রন্থ	--	২৪টি	ছোটদের কবিতা	--	১৩টি
উপন্যাস ও গল্প	--	৭টি	নাটক	--	৩টি
প্রবন্ধ গ্রন্থ	--	৫টি	সংগীত গ্রন্থ	--	১৮টি
বিবিধ	--	৫টি			

এই তালিকা অবশ্য নির্ভুল নয়; পরবর্তী সময়ের অনেক সংকলনের নামও গ্রন্থ হিসেবে এতে যুক্ত হয়েছে।

নজরুলের বহুল প্রচলিত ২০টি কাব্যগ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা কয়েক শত। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত *নজরুল রচনাবলীতে* এর বাইরে আরও শতাধিক অপ্রকাশিত কবিতা ও গান আছে । তিনটি উপন্যাস ছাড়া কথাসাহিত্যে নজরুলের অবদান কয়েকটি গল্প । পাঁচটি প্রবন্ধগ্রন্থের বাইরেও তাঁর রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা বহু। নাটকের ক্ষেত্রও তাঁর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকে নি। তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলির সন্ধান এবং প্রকাশ এখনও অব্যাহতভাবেই চলছে । তিনি সুশৃঙ্খল মানুষ ছিলেন না; সংরক্ষণের মাধ্যমে জীবনবৃত্তান্তকে গৌরবান্বিত করার স্পৃহাও তাঁর ছিল না । তাই তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের সন্ধান পাওয়া যাবে আরও দীর্ঘকাল ধরে।

মাত্র দু'টি যুগের সক্রিয় শিল্পীজীবনে কাব্য, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ মিলিয়ে অর্ধ-শতাধিক গ্রন্থ ; অনূ্যন ৩ হাজার সংগীত; দুটি চলচ্চিত্র-কাহিনী (বিদ্যাপতি, ১৯৩৮; সাপুড়ে ১৯৩৯) এবং ৮টি গীতিনাট্য ও রেকর্ডনাট্য (চাষার সঙ, ঠগপুরের সঙ, মেঘনাদ বধ; বিদ্যাপতি; সাপুড়ে, ঈদুলফেতর, প্রীতি উপহার ও বনের বেদে) - এই সৃষ্টিসম্ভার যে-কোনো সচেতন পাঠককে বিস্মিত না করে পারে না। গবেষক পণ্ডিতের কাছে হয় তো এর অনেক তুলনা পাওয়া যাবে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে পরিমাণের দিক থেকে এর একটিই তুলনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নজরুলের সুস্থ অবস্থায় শিশু-কিশোরদের জন্য তাঁর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, *ঝিঙেফুল* (১৯২৬) ও *পুতুলের বিয়ে* (১৯৩৪)। এর মধ্যে প্রথমটি ১৪টি কবিতার সংকলন; দ্বিতীয়টি ৬টি নাটিকা ও ৩টি কবিতার সংকলন। এছাড়া সুস্থ অবস্থায়

তিনি স্কুলপাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে *মক্তব সাহিত্য* (১৯৩৫) নামে একটি দ্রুতপঠন জাতীয় পুস্তক সংকলন করেছিলেন ; এতে তাঁর নিজের লেখা ছাড়া রবীন্দ্রনাথসহ আরও কয়েকজনের লেখা স্থান পেয়েছে । *পুতুলের বিয়ে*-র 'সাত ভাই চম্পা' অংশটি সম্ভবত পৃথক পুস্তিকা হিসেবেও মুদ্রিত হয়েছিল (১৯২৬) । পঞ্চাশের দশকে বেরিয়েছে তাঁর কিশোর-রচনায় বাছাই করা সংকলন *সঞ্চয়ন* (১৯৫৫) ; ষাটের দশকে *ঘুম জাগানো পাখী* (১৯৬৪), *ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি* (১৯৬৫) এবং *পুতুলের বিয়ের* সঙ্গে কয়েকটি কবিতা যুক্ত করে *পিলে পটকা* ও *পুতুলের বিয়ে* (১৯৬৩) । মৃত্যুর পর তাঁর অগ্রন্থিত কবিতাকে সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮২) চারটি সংকলন : *ফুলে ও ফসলে, ভোরের পাখী, তরুণের অভিযান* ও *মটকুল মাইতি* । তাঁর স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত কিশোর নাটিকা *জাগো সুন্দর চির কিশোর* প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা (১৯৯১) ও কলকাতা (১৯৮২) থেকে। এ-সবের বাইরেও শিশু-কিশোরদের উপযোগী নজরুলের কিছু রচনা অগ্রন্থিত অবস্থায় থাকা বিচিত্র নয়।

আমাদের স্কুল ও কলেজে কিশোররা নজরুলের যে-কবিতাগুলি পাঠ করে, তা উপরোক্ত তালিকায় নেই। 'বিদ্রোহী', 'কামাল পাশা', 'শাত্-ইল-আরব', 'খেয়া-পারের তরণী', 'শিকল-পরার গান', 'মানুষ', 'সাম্যবাদী', 'ছাত্রদলের গান', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'দারিদ্র্য', 'অগ্র-পথিক' প্রভৃতিকে কিশোর-উপযোগী কবিতা বলার কোনো যুক্তি আছে কিনা সন্দেহ ! নজরুলকে 'প্রবল মুসলমান কবি' প্রমাণ করার জন্য হামদ্-নাত ও মুনাজাত জাতীয় যে কবিতাবলি পাঠ্যগ্রন্থে ষাটের দশক থেকে স্থান পেয়েছে, তাও অনেক সময় শিশুচিত্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাবলি নির্মল; কিন্তু সবসময় কিশোরদের বোধগম্য নয়। এ-সবের ফলে নজরুলের শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রকৃত অবয়ব সম্পর্কে আমাদের যে-ধারণা তা অসম্পূর্ণ , খণ্ডিত এবং অনেক সময়ে বিভ্রান্তিপূর্ণ ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতার কারণে নজরুলের শিক্ষাগত মান সম্পর্কেও সাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি রয়েছে। এবং এই বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার সময় আমরা ভুলে যাই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও এর চেয়ে বেশি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একটি উচ্চ-মেধাসম্পন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শিক্ষিত হয়েছিলেন। নজরুলের পারিবারিক-পরিমণ্ডলে ছিল আরবি-ফার্সির চর্চা, লেটো-যাত্রাদলের মাধ্যমে লোকজ ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীর পরিচয় ; পরে সৈনিক জীবনে পারস্য ও সিমেটিক সভ্যতার বিপুল সান্নিধ্য প্রভৃতি তাঁর শিক্ষাকে ঋদ্ধ করেছিল । সেই তিরিশের দশকেই তিনি শুধু শেলি-মিল্টন-ইয়েট্স-গোর্কি-বার্নাড শ -কিট্স -শেকভ-টলস্টয়-হুইটম্যান-কিপলিনই পাঠ করেন নি ; এরই সঙ্গে আত্মস্থ করেছিলেন যোহান বোয়ার, জেসিতো বেনাভাঁতে, লিওনিদ আঁদ্রিভ, ন্যুট হামসুন, ওয়াদিশল রেঁমদ, অনাতোল ফ্রাঁস, মেরোযোভস্কি, দস্তয়েভস্কি, লেগারলফ, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, নোগুচির কালজয়ী রচনাবলি ।

নজরুল যখন শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন, বাংলা শিশুসাহিত্যের বয়স তখন শতাব্দী প্রাচীন। শ্রীরামপুর মিশনের *দিগদর্শন* (১৮১৮), স্কুল বুক সোসাইটির *পশ্বাবলী* (১৮২২)-র যুগ পার হয়ে বিদ্যাসাগর হয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে চলছে বাংলা শিশুসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন। এরই মধ্যে বাংলার শিশু-কিশোরদের চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *খুকুমণির ছড়া* (১৮৯৯), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ক্ষীরের পুতুল* (১৮৯৬), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাকুরমার ঝুলি* (১৯০৬) এবং সর্বোপরি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় *সন্দেশ* (১৯১৩)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শিশু* (১৯০৩) এবং *শিশু ভোলানাথ* (১৯২২) তখনই বহুল পঠিত। সুকুমার রায় আবির্ভূত হয়েছেন (মৃত্যু ১৯২৩) তাঁর *আবোল-তাবোল* (১৯২৩) ও *খাই খাই* (১৯৫০)-এর রচনাবলি (রচনাকাল ১৯২২ এর মধ্যে) নিয়ে। এরকম একটি ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়েই বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অঙ্গনে নিজের আগমনী-বার্তা ঘোষণা করেন কাজী নজরুল ইসলাম।

।। চার ।।

ঝিঙে ফুল -এর নাম কবিতা ঝিঙে ফুল। ফুল হিসেবে এর মূল্য অতি সামান্য, ব্যঞ্জন রূপেই এর পরিচিতি অধিক; কিন্তু নজরুল একেই শিশুর মনোজগতে রঙিন করার মত করে উপস্থাপিত করেছেন :

ঝিঙে ফুল ! ঝিঙে ফুল।
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল-
ঝিঙে ফুল।

গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলো দুল -
ঝিঙে ফুল ।।

এই কবিতার ছন্দ ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা মনে করিয়ে দেয়। পাতা এবং ফুলের বর্ণনা মিলে এবং বিচিত্র রঙের উল্লেখের মাধ্যমে নজরুল বাংলার দরিদ্র-ঘরের আঙ্গিনার এ লতাকে নবরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

ঝিঙে ফুল-গ্রন্থের অত্যন্ত জনপ্রিয় চারটি কবিতা 'খুকি ও কাঠ্‌বেড়ালি', 'খাঁদু-দাদু', 'প্রভাতী' ও 'লিচু-চোর'। 'প্রভাতী' ছাড়া এর বাকি তিনটিই শিশুদের

নিত্যদিনের দুষ্টুমির জগত থেকে চুরি করা। 'খুকি ও কাঠবেড়ালি'তে পেয়ারা আত্মসাত করার জন্য খুকির চেষ্টা, 'খাঁদু-দাদু'তে 'ন্যাক ডেঙাডেং ড্যাং'-এর ক্লাসিক প্রয়োগ যা বাংলায় 'নন-সেন্‌স'-এর উপমা হতে পারে এবং 'লিচু-চোর' -এ দুষ্টমির সাজা কিশোর-জগতের একান্ত আপন জিনিস । এর পরিবেশনা-শৈলী অতুলনীয় ; কিশোর-আবৃত্তির জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। 'প্রভাতী' অনেকাংশে শিশুতোষ।

তুলনামূলকভাবে অপরিচিত *ঝিঙে ফুল*-এর চারটি কবিতা -- 'খোকার বুদ্ধি', 'চিঠি', 'হোঁদল-কুৎকুতের বিজ্ঞাপন' এবং 'পিলে পটকা' কাব্য-বিচারে অত্যন্ত উঁচুমানের । লক্ষ্মী ছোটবোনকে লেখা 'চিঠি'তে কৌতুকবোধ যেমন তীব্রভাবে প্রকাশিত; ছন্দ-সৃষ্টির জন্য শব্দ-বাছাইয়ের মুন্সিয়ানাও তুলনাহীন

ভাঙেনি বৌদির ঠ্যাংটা ।
রাখালু কি ন্যাংটা ?
বলিস তাকে, রাখালী !
সুখে রাখুন মা কালী !
বৌদিরে ক'স দোত্তি
ধরবে এবার সত্যি । ...

নজরুলের হাতে 'হোঁদল-কুঁৎকুঁত' ও 'পিলে পটকা'র ছবিও ফুটে ওঠেছে চমৎকারভাবে :

মিচকে-মারা কয়না কথা মনটি বড় খুঁৎখুতে ।
'ছিচকাঁদুনে' ভাবিয়ে ওঠেন একটু ছুঁতেই না ছুঁতে ।
ভ্যাবলা ছেলে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে থেকে গাল ফুলান,
সন্দেশ এবং মিষ্টি খেতে - বাসরে বাস - এক জাম্বুবান ।...

এবং

উটমুখো সে সুঁটকো হাশিম,
পেট যেন ঠিক ভুঁটকো কাছিম !
চুলগুলো সব বাবুই দড়ি -
ঘুসকো জ্বরের কাবুয় পড়ি ।
তিন-কোণা ইয়া শক্ত মাথা ,
ফ্যাসকো-চোখো ; হস্ত ? হাঁ তা ...

উল্লেখ্য, নজরুলের আগে দক্ষিণারঞ্জনের কলম ও তুলিতে ভূত-পেত্নির অদ্ভুত চেহারা আছে ; অবনীন্দ্রনাথেও অদ্ভুত মানুষ আছে — তবে তা মূলত আচরণগত

এবং প্রচলিত লোককথা অনুসারী। ছড়ার ছন্দে এমন চেহারা নেই । একই বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের *খাপছাড়া* বেরোয় এর ১০ বছর পর । নজরুল-পূর্ব রচনার মধ্যে সুকুমার রায়ের *আবোল তাবোল* ও *খাই খাই* গ্রন্থেই শুধু এ-ধরনের রসোত্তীর্ণ ছড়া ও কবিতা পাওয়া যায় । মনে রাখা দরকার, বিশের দশকের শুরুতে নজরুল যখন *ঝিঙে ফুল*-এর কবিতা লিখছেন ; একই সময়ে লিখেছেন *অগ্নিবীণা*-র 'বিদ্রোহী' এবং *দোলন-চাঁপার* 'পূজারিণী'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, দক্ষিণারঞ্জন, অবনীন্দ্রনাথ -৪ জনই ছিলেন চিত্রকর। কিন্তু চিত্রকর না হয়েও নজরুলের অদ্ভুত অবয়ব সৃষ্টি নি:সন্দেহে বিস্ময়কর।

পুতুলের বিয়ে গ্রন্থের মূল রচনা 'পুতুলের বিয়ে' শীর্ষক নাটিকা । ৮টি চরিত্র নিয়ে রচিত এ-একাঙ্কিকায় ছোটরা যে শুধুই ছোটদের মত ভাবে না, তার চিত্রই পাওয়া যায়। এই নাটিকায় নজরুল মধ্য-বিশের দশক থেকে বাংলায় ছড়িয়ে পড়া হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংকটের মধ্যে সম্প্রীতির কথা বলতে চেয়েছেন কম্‌লির সংলাপে :

> ... বাবা বলেছেন, হিন্দু-মুসলমান সব সমান । অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন । ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা । . . . .

'পুতুলের বিয়ে' নাটিকার প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে রয়েছে গান ও ছড়া । এর কয়েকটি ছড়া বাংলা শ্রেষ্ঠ ছড়ার একাসনে বসার দাবিদার :

> ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়
> যাইতে যাইতে খ্যাচ্‌খ্যাচায়
> প্যাঁচায় গিয়া উঠ্‌ল গাছ ,
> কাউয়ারা সব লইল পাছ ।
> প্যাঁচার ভাইশ্‌তা কোলা ব্যাং
> কইল, চাচা দাও মোর ঠ্যাং । . .

পুতুলের বিয়ে গ্রন্থে আরও ৫টি একাঙ্কিকা আছে - - 'জুজুবুড়ির ভয়', 'কে কি হব বল', 'ছিনিমিনি খেলা', 'কানামাছি' এবং 'নবার নাম্‌তা পাঠ'। এগুলির সংলাপ গদ্যে-পদ্যে মেশানো ; মূলত খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমনভাবে লেখা । এসব রচনার ক্ষেত্রে লোকক্রীড়ার সংলাপ ও ছড়া ব্যবহারের শৈশবস্মৃতি সম্ভবত নজরুল-মনে কাজ করেছে । 'সাত ভাই চম্পা'র চার সহোদরের কাব্য-সংলাপও এতে স্থান পেয়েছে । *পুতুলের বিয়ে* গ্রন্থের 'শিশু যাদুকর' অপেক্ষাকৃত গভীর ও গম্ভীর কবিতা । নদী-সাগর পার হয়ে যে-শিশুর আবির্ভাব তার রূপকে প্রকৃতির রূপের সঙ্গে একাকার করে দেখেছেন কবি। রবীন্দ্র-যুগের প্রভাব এতে সুস্পষ্ট । এ-প্রসঙ্গে *ছায়ানট*-এর 'পলাতকা' (১৯২১)

কবিতাটির উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রমানে উত্তীর্ণ এ-কবিতায় এক শিশুর উদ্দেশ্যে কবির নিবেদন অপূর্ব ভাবাবেগ ও শিল্পসুষমায় প্রতিষ্ঠিত :

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশির ডাক শুনেছিস্ ওরে চখা ?
ওরে আমার পলাতকা !
তোর পড়লো মনে কোন্ হারা ঘর,
স্বপন-পারের কোন্ অলকা ?
ওরে আমার পলাতকা ! . . .

পুতুলের বিয়ে-র পরিবর্তিত সংস্করণ *পিলে পটকা ও পুতুলের বিয়ে*-তে সংযুক্ত নতুন কবিতার অধিকাংশ *ঝিঙে ফুল* থেকে সংকলিত। তবে অন্তত তিনটি নতুন কবিতা -- 'ফ্যাসাদ', 'মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়' এবং 'বগ দেখেছ ?' সার্বিক বিবেচনায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এগুলির কয়েকটি চরণ যথাক্রমে নিম্নরূপ :

(ক) শয্যা ছেড়ে নিত্য ভাবে গোমড়া-মুখো পেসাদ ,
এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকা মস্ত একটা ফ্যাসাদ !
রাত থাকতে সূয্যি ওঠে, ঘুমোয় বল কখন্ !
তার ওপরে জ্বালায় হ'রে , "বেলা হ'ল খোকন ।" . . .

(খ) মট্‌কু মাইতি বাঁটকুল রায়
ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে যায়
বেঁটে খাটো নিট্‌পিটে পায়
ছেৎরে চলে কেৎরে চায় । . . .

(গ) হ্যালো পুটে, হ্যালো হাঁদা ?
হ্যালো ন্যাড়া, ঘুঁটে খাঁদা !
বগ অর্থাৎ বগ্‌লা অর্থাৎ কুঁজো পাখী সাদা পাখা ।
রামার বুড়ো দাদামশাই, মামার খুড়ো
থুখুড়ো নুন্নড়ো যেমন সুটকো বাঁকা ।
বুঝলে নাকো ? আচ্ছা রসো, উবু হয়ে সামনে বসো,

তবে এর দ্বিতীয়টি একেবারে উদ্দেশ্যহীন নয়, বাঙালির প্রথম মহাযুদ্ধে যাত্রার ছবি আছে এতে।

নজরুলের অগ্রন্থিত রচনার মধ্যেও বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সংকলনে স্থান পেতে পারে এমন রচনার সংখ্যা স্বল্প নয়। যেমন :

গিরগিটি নাড়ে মাথা, টিকটিকি নাড়ে লেজুড়,
গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে বুনো সজারুর,
হুমড়ি খেয়ে পড়ে গঙ্গা ফড়িং ঘাড় ঘাড় দুম্‌ড়ি ।।
মিস্ বিল্লির সাথে
এসে দিল্লী হতে হুলো সেই জলসাতে
গানে গমক - সীড়ে খাম্বাজ - হাম্বীরে-
কঁকিয়ে ওঠে ভয়ে কুঁকড়ো - কুঁকড়ি ।।

[জলসা]

অথবা 'তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে'-র বিপরীতে স্থাপন করা যায় 'তালগাছ' কবিতাটি :

ঝাঁকড়া চুলো তালগাছ, তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই ।
আমার মত পড়া কি তোর মুখস্থ হয় নাই ।।
আমার মত এক পায়ে ভাই,
দাঁড়িয়ে আছিস কান ধরে ঠায়
একটুখানি ঘুমোয় না তোর পণ্ডিত মশাই ।।

এর সঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'প্রজাপতি । প্রজাপতি ! / কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা ।' । অথবা আবদুল- আজীজ আল আমান উদ্ধারকৃত 'সারস পাখি' কবিতাটি :

সারস পাখী ! সারস পাখী !
আকাশ-গাঙের শ্বেত কমল !
পুষ্প পাখী ! বায়ুর ঢেউ-এ
যাস্ ভেসে তুই কোন মহল ?

তোরে ময়ুর-পঙ্ক্ষী করি'
পরীস্থানের কোন্ কিশোরী
হাল্‌কা পাখার দাঁড় টেনে যায় ?
নিম্নে কাঁপে সায়র-জল ।
গগন-কূলে ঘুম ভেঙে চায়,
মেঘের ফেনা অচঞ্চল !

।। পাঁচ ।।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের পরিমণ্ডলে নজরুল ইসলাম স্বভাবতই প্রকটভাবে 'বিদ্রোহী' নন, 'প্রেমিক'ও নন। তবে তিনি প্রবলভাবে অসাম্প্রদায়িক; ঠাট্টার ছলে হলেও প্রচলিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে স্পষ্টবাক্ এবং দ্বিধাহীনভাবেই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে। এ-সব রচনায় দরিদ্র ও বঞ্চিতের পক্ষে তাঁর অবস্থানও দৃঢ়। বিদ্রোহীর 'এ্যাডভেঞ্চারইজ্‌ম'ও ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত হয়ে উঠেছে এতে।

নজরুলের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিরাভরণরূপে প্রকাশিত হয়েছে *পুতুলের বিয়ে* নাটকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে খেঁদি, কমলি ও টুলির নিম্নোক্ত সংলাপ উদ্ধৃতিযোগ্য :

খে'দি ।। লে ভাই, তুরা যদি ঝগড়াই করবি, বিয়া হবেক কখন ? ইদিকে লগনের বেলা যে ব'য়ে গেল। আচ্ছা ভাই, মুসলমানের পুতুলের সাথে তোর পুতুলের বিয়া হবেক কি ক'রে খ।

কমলি।। না ভাই, ও কথা বলিস্‌নে। বাবা বলেছেন, হিন্দু মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্ম্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা। বাবা আমাকে একটা গান শিখিয়েছিলেন, টুলি তুইও ত জানিস ও গানটা, গা না ভাই আমার সাথে।

(গান)

মোরা এক বৃন্তে দুটী কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুস্‌লিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ।।
এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি-শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান ।।
মোরা এক সে দেশের খাই গো হাওয়া এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক সে ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটীতে পাই
কেউ গোরে, কেউ শ্মশানে ঠাঁই।
মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান।

টুলি ।। সত্যি ভাই, এক দেশে জন্ম, এক মায়ের সন্তান। অন্য ধর্ম্ম বলে কি তাকে ঘেন্না করতে হবে ? - এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে - আমি পুরুত ঠাকুরকে ডেকে আনি ।

শিশুতোষ কবিতা 'ভাই'কে আপাতত নির্মল সরল মনে হলেও এর মধ্যে বাংলা মায়ের দু'সন্তান হিন্দু-মুসলমান-এর ভাই ভাই-এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং বিশের দশকের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মধ্যে পরস্পরকে দূরে না ঠেলার আবেদন স্পষ্ট :

ভায়ের দোরে ভাই কেঁদে যায়
তুলে নে না তার কোলে।
মুছিয়ে দে তার নয়নের জল
সে যে আপন মায়ের ছেলে ।।

এতদিন যদি ছিলে এক ঠাঁই
আজ কেন তবে হবি ভাই ভাই,
ভাই বিনে তোর আর কেহ নাই
দিতে প্রাণ অবহেলে ।।

বিপদেতে পাবি কাহারে তখন
ভাই যদি রয় ফিরায়ে বদন,
সেই ভায়ে তোর পরের মতন
দিস্‌নে আজিকে ঠেলে ।।

'ভাই' কবিতায় নজরুল আবেদনের সুরে যে-বক্তব্য দিয়েছেন, তাকেই আবার ব্যঙ্গের সুরে তুলে ধরেছেন 'গোঁড়া ও পাতি' কবিতায় । এর পটভূমি বিশের দশকের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ :

আবু আর হাবু দুই ভায়ে ভায়ে সদাই ভীষণ দ্বন্দ্ব !
বোঝালে বোঝে না, এক ভাই কানা আর এক ভাই অন্ধ ।।
হাবু বলে, ''আবু, বিশ্রী দেখায় শীগ্‌গির চাঁচ দাড়ি । ''
আবু বলে, ''দাদা পেঁয়াজের ঝাড়্ ঐ টিকি কাট্ তাড়াতাড়ি ।।''
টিকি ও দাড়িতে চুলোচুলি বাধে, ট্রাম বাস হয় বন্ধ ।।. . . .
হাবু বলে, ''আবু কাছা দে শীগ্‌গির ।'' আবু বলে ''ছাড় গামছা।''
হাবু ছুটে আনে খুন্তি, আবু উ'চাইয়া ধরে চাম্‌চা ।

হাবু সে দেখায় যুযুৎসু প্যাঁচ, আবু মোহরমী ছন্দ ।।

নজরুলের এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব যে কতটা গভীরে প্রোথিত ছিল, তার স্বাক্ষর রয়েছে *ঝিঙে ফুল*-এর বেশ কিছু কবিতায় । শৈশবে মক্তবে শিক্ষা ও শিক্ষকতা, মাজারে খাদেম-এর কাজ, মসজিদে ইমামতি - নজরুল জীবনের এ সকল পর্যায় সকলেরই জানা । তা সত্ত্বেও 'প্রভাতী' কবিতায় তৎকালীন কলকাতার পরিচিত দৃশ্যই ফুটে উঠেছে :

রবি মামা
দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান,
গায় গান
শোনো ঐ, ''রামা হৈ ! . . .

মক্তবের ছাত্রদের দ্রুতপঠন হিসেবে ব্যবহারের জন্য নজরুল ৩০-এর দশকের মাঝামাঝি (আশ্বিন, ১৩৪২) *মক্তব-সাহিত্য* শীর্ষক পুস্তকটি রচনা করেন । ভূমিকায় কবি স্পষ্ট করেই বলেন :

> আমি আমার কবিতায়, ইসলামী গানে, গল্প, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে বক্তৃতায় আশৈশব ইসলামের সেবা করিয়া আসিতেছি । আমারি বহু চেষ্টায় আজ ইসলামী গান রেকর্ড হইয়া ঘুমন্ত আত্মভোলা মুসলিম জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আরবী-ফার্সী শব্দের প্রচলন বাঙলা সাহিত্যে আজ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে । . . . . . জ্ঞানের প্রথম উন্মেষকালে যদি তাহারা ইসলাম ধর্মের, মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রথম সবক পায়, তাহা হইলেই আমাদের ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের ইমারতের ভিত্তি পাকা হয়।

মক্তব-সাহিত্যে নজরুল রচিত 'চাষী', 'মৌলবী সাহেব', 'ঈদের দিনে' প্রভৃতিতে ধর্মের কথা আছে, তবে তাতে মানবতার শাশ্বত বাণীই প্রচ্ছন্ন। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থ মক্তব-পাঠ্য হলেও এতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্থান দিতেও নজরুল দ্বিধা করেন নি। আমরা উল্লেখ করেছি যে, ৩০-এর দশক ও ৪০-এর দশকের শুরুতে নজরুলের ধর্মপ্রীতিতে যুক্ত হয়েছিল আধ্যাত্মিকতা। 'আয় ঘুম' (চৈত্র, ১৩৩০) এবং 'ঘুম ভাঙার গান' -এর নিম্নোদ্ধৃত চরণে বৈষ্ণব-প্রভাব লক্ষণীয় :

আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়
মোর গোপাল ঘুমায়। . . .
তোরে কে বলে চঞ্চল ? এক চোখো সে,
মোর শান্ত গোপাল থাকে গোষ্ঠে বসে,
তারে কে বলে ঝড় তোলে থির যমুনায়,
সে যে দিনরাত ঘোরে তার মার পায় পায় ...

এবং

জাগো জাগে গোপাল নিশি হ'ল ভোর,
কাঁদে ভোরের তারা হেরি' তোর ঘুম ঘোর ।।

ওরে দামাল ছেলে তুই জাগিস্ নি তাই
বনে জাগেনি পাখী, ঘুমে মগ্ন সবাই,
বাতাস নিশ্বাস ফেলে' খুঁজিছে বৃথাই
তোর বাঁশরী লুটায়ে কাঁদে আঙিনায় মোর ।।

ধোয়াবে বলিয়া তোর চোখের কাজল
থির হ'য়ে আছে ঘাটে যমুনার জল।

পুতুলের বিয়ে নাটকে বেগমের একটি গানে সুফিবাদের প্রতি কবির আসক্তির প্রকাশ রয়েছে :

শাদী মোবারক শাদী মোবারক ।
দেয় মোবারক-বাদ আলম্ রসুলে-পাক আল্লা হক ।।
আজ এ খুশীর মহফিলে
দুলহা ও দুলহিনে মিলে
মিলন হ'ল প্রাণে
মাশুক আর আশক ।।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের পরিমণ্ডলেও নজরুল ইসলাম দরিদ্রের প্রতি চরমভাবে সহানুভূতিশীল এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণে সার্থক । 'খোকার গল্প বলা' শীর্ষক কবিতায় 'শ্রীযুত খোকা' যখন মাকে রাজরাজড়ার গল্প বলছে, তখনও তার দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা ঢাকা পড়ছে না :

একদিন না রাজা -
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা ।
রাণী গেলেন তুলতে কল্মী শাক
বাজিয়ে বগল টাক্ ডুমাডুম টাক ।
দুটোয় গিয়ে এলেন রাজা তিন দ্বিগুণে সাতটার সময় ।
বলত মা-মনি তুমি, ক্ষিদে কি তায় কম হয় ?

চাবি দেওয়া রাজবাড়ীতে ওগো,
পান্তা ভাত কে বেড়ে দেবে ?
রাজা এখন ক্ষিদের জ্বালায় ভোগো !

'জাগো সুন্দর চির-কিশোর' নাটিকায় কল্পনার রাজ্যে গিয়েও কঙ্কন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলতে পারছে না :

বন্য মেয়ে ! আমরা তোরে করেছি রাজরাণী,
দুলাতে তোর পেতেছি মা সোনার আসনখানি ।
খামার ভ'রে রাখব ফসল, গোলায় ভ'রে ধান,
ক্ষুধায়-কাতর ভাইগুলিকে দেব আমি প্রাণ ।
এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখব চির-তাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা ।।

অথবা 'খুকী ও কাঠবেড়ালী'কে যখন নাট্যরূপ দেন নজরুল, তখনও খোকা-খুকুর কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যায় :

মোদের জামাও আছে পকেটও আছে
পয়সা কিন্তু নাই রে ।।

শুধু দরিদ্রের দুঃখ বা বঞ্চিতের বেদনা নয়, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সংক্রান্ত বিবেচনায় নজরুল ছিলেন অত্যন্ত সচেতন । 'বকুল' (আষাঢ় ১৩২৭) শীর্ষক কবিতায় প্রতীকের মাধ্যমে এর প্রকাশ অসাধারণ :

জল-ভরা এই বর্ষাতে
হায় কারে সে তর্‌সা'তে
পল্লী হতে আন্‌বি বয়ে অশ্রু গোটা দুই ;
আর চোখের জলে ভিজিয়ে দিবি রাজবাগানের ভুঁই !

মা-দুর্গার কাছে সকলে বর চাইছেন, তাতেও ('সবাইকে তুই বর দিলি মা') ঠাট্টার ছলে দারিদ্র্যের বেদনা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত:

মা, রাত্রে যেন কাম্‌ড়ায় না ছারপোকা আর মশা,
আর দিনের বেলায় সইতে নারি গায়ে মাছি বসা ।
মা, খাবার কথা বলি যদি, ভাববি পেটুক ছেলে
আমি ভাত না খেয়েও থাক্‌তে পারি পোলাও লুচি পেলে ।

ধনী-দরিদ্রের এই ব্যবধানের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় 'গরীবের ব্যথা' (আশ্বিন ১৩২৭) কবিতায়। এর মূল অংশ প্রণিধানযোগ্য :

এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি,
পরনে নেই ছে'ড়া কানি, সারা গায়ে ধূলি,-
সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি,
ক্ষিধের জ্বালায় ক্ষুণ্ন, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি,
অযতনে বাছাদের হায়, গা গিয়েছে ফেটে,
ক্ষুদ ঘাঁটা তাও জোটে নাক সারাটী দিন খেটে'
এদের ফেলে ওগো ধনী ওগো দেশের রাজা !
কেমন করে রোচে মুখে মণ্ডা মিঠাই খাজা ?

ক্ষুধায় কাতর যখন এরা দেখে তোমায় খেতে,
সে কি নীরব যাচঞা করুণ ফোটে নয়নেতে !
তা' দেখে ছিঃ, অকাতরে কেমনে গেলো অন্ন ?
দাঁড়িয়ে পাশে ভূখা শিশু ধূলি-ধূসর বর্ণ !
রাখ্‌ছে যে চা'ল মরাই বেঁধে, চারটী তারই পেলে,
আ-লোনা মাড়-ভাত খেয়ে যে বাঁচে এ-সব ছেলে !
পোশাক তোমার তর-বেতরের, নেই ক এদের টেনা,
যে কাপড়ে মোছ জুতো, এদের তাও মেলে না।
প্যাটরা-ভরা কাপড় তোমার, এরা মরে শীতে,
সারাটী রাত মায়ে-পোয়ে শুয়ে ছাঁচ-গলিতে।
. . . .
তোমাদের মা খোকার একটু গাটি গরম হলে,
দশ ডাক্তার দেখে এসে; এরা জ্বরে মলে -
দেয় না মা কেউ একটী চুমুক জলও এদের মুখে,
হাড়্-চামড়া হয়ে মরে মায়ের বুকে ধুঁকে !
আনার আঙ্গুর খায় না গো মা রুগ্ন তোমার ছেলে ;
এরা ভাবে রাজ্যি পেলুম মিছরি একটু পেলে।

নারীকে বঞ্চিত করার বিপক্ষে নজরুলের প্রতিবাদ ইতিবাচক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে 'জাগো সুন্দর চির-কিশোর' নাটিকার কল্পনার সংলাপে :

> ... ওগুলো মুক্তো-মানিক নয় । তোমরা শুধু ঝিনুক কুড়িয়ে এনেছ। যেদিন তোমার দাদারা সত্যিকার সাগর জয় করে আসবে আর তোমরা মেয়েরা তাদের সাহায্য করবে ঐ সাগর অভিযানে - সেই দিন সত্যিকারের মুক্তো-মানিক পাবে । তার আগে নয় ।

কাজী নজরুল ইসলামের অতি উপস্থাপিত বিদ্রোহী রূপটি শিশু-কিশোর কবিতার পরিমণ্ডলে স্বভাবতই কোমল, মৃদু ও হালকা । এর একটি প্রচ্ছন্ন প্রকাশ দেখা যায় প্রচলিতের বিরুদ্ধে চলা এবং প্রচলিত নিয়ম না মানার প্রবণতার মধ্যে । প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা 'এশটাবলিশমেন্ট'-এর বিরুদ্ধে তাঁর যে ক্ষোভ, এর একটি প্রকাশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অংশ নেয়ার অনীহার মধ্যে। তাঁর বিখ্যাত গান 'প্রজাপতি'র দু'টি চরণ এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি ! তুমি নিয়ে যাও সাথী করে তোমার সাথে ।

প্রতিদিনের বাঁধাধরা রুটিন যে কবির কাছে কত আনন্দহীন ছিল, তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে 'ফ্যাসাদ' শীর্ষক ব্যঙ্গকবিতায় :

শয্যা ছেড়ে নিত্য ভাবে গোম্‌ড়া-মুখো পেসাদ,
এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকা মস্ত একটা ফ্যাসাদ ।
রাত থাক্‌তে সূয্যি ওঠে, ঘুমোয় বল কখন্‌ !
তার উপরে জ্বালায় হ'রে, ''বেলা হ'ল খোকন ।''
. . .
উঠল যদি শরীরটাকে ছালার ভিতর পোরো,
হাত মুখ ধোও, হামা দিয়ে জামায় ঢুকে ঘোরো !

উঠলে না ঘুম হ'তে সে, হাত মুখও নায় ধুলে,
শরীরটাকেও না হয় দিল জামার ভিতর তুলে;
তারপরে যাও পাঠশালাতে, সেথায় আবার থাকে,
এক যে জুজু 'গুরুমশাই' সবাই বলে তাকে । . . . .
বাড়ী এসে আর এক ফ্যাসাদ, ঝি বেটি না ধ'রে,
আচ্ছা ক'সে চুবিয়ে দিল গামছা ডলা ক'রে ?
গরু খেদান খেদিয়ে আসে কথায় কথায় বাবা,

বাবায় ছেড়ে কাকায় ধরে, ফ্যাসাদ ।. কোথায় যাবা ?
বিকেল বেলায় খেলতে যাবো মা পথে হ'ন বাধা,
মা যদি বা থামেন, এসে কর্ণ ধরেন দাদা !

সাঁঝ না হ'তেই পড়ার তাগিদ তাড়ার ওপর তাড়া,
একটু যদি রাত্রি বেলায় বেড়াতে পায় পাড়া
বাবার, মায়ের হুম্‌কি সমান-ঘুম যদি না আসে,
হাসতে নারে হাসির চোটে পেট যদিও ফাঁসে !
চুলগুলো সে রাখবে বড় -- বাবায় নাপিত ধ'রে,
ন্যাড়া ক'রে দেয় মাথা হায় আমড়া-ভাতে ক'রে । . . .

এমন কি গুরুজন সভায় বিপ্লবী অভিবাদন যুক্ত করতেও দ্বিধা করেন নি :

এই সভায়
আজ সবায়
কর প্রণাম
লাল সালাম .

বিদ্রোহীর 'এ্যাডভেঞ্চারইজ্‌ম' আছে নজরুলের বহু সংখ্যক কিশোর কবিতায় । উদাহরণ হিসেবে দু'টির উল্লেখ করা যেতে পারে -- 'সানির ইচ্ছা' এবং 'ছোট হিটলার' । প্রথমটিকে আপাতত রূপকথার রাজ্যে অভিযান মনে হলেও, দ্বিতীয়টিতে যুদ্ধ-অভিযান সুস্পষ্ট :

চোখ পাকিয়ে এগোই যদি, বল্‌বে কেঁপে সব মশাই,
'মুসোলিনির মেসো এবার যুদ্ধে এলেন, রক্ষে নাই ।'
রাগে-খোলা চোখ দেখে মোর গোলাগুলি বারুদ বম্‌--
ঠাণ্ডা মেরে হয়ে যাবে কুল্‌পি-বরফ সেই রকম !
'ট্যাঙ্কে' থোড়াই কেয়ার করি, ল্যাং মারা মোর এই যে ঠ্যাং
এই ঠ্যাঙে ট্যাঙ্ক ছুঁড়ব, যেমন লাথিয়ে ছুড়ি কোলা ব্যাঙ !
এ 'শেল' ও 'শেল' হেঁসেল, জানি সব শেলেরই আগুন-তাত,
দেখ্‌লে আমায় সব বোমারু-হবেন ঠুঁটো জগন্নাথ !

কাজী নজরুল ইসলামের ‘অপরূপ সে দুরন্ত’ যেন ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কিশোর-সংস্করণ। রূপকথার জগতে ভ্রমণ করে চিরাচরিতকে অস্বীকার করে দুরন্তের অভিযান। কিশোর-মনকে ‘বিদ্রোহ’-এর সঙ্গে এক অপূর্ব শিল্পবৈশিষ্ট্যে সমন্বিত করেছেন এ-কবিতায় নজরুল :

সে ঘুরে বেড়ায় নীল আকাশে
চাঁদের সাথে মুচ্‌কি হাসে,
গুঞ্জরে সে মৌ-মক্ষীর গুঞ্জনে,
সে ফুলের সাথে ফোটে, ঝরে পরাগ হ'য়ে অঙ্গনে।
তার চোখের পলক ভোরের তারায় ঝলে,
ধূমকেতু তার ফুলঝুরি, সে উল্কা হয়ে চলে!
        অপরূপ সে দূরন্ত,
        মন সদা তার উড়ন্ত! . . . .
        সে ঝড়ের সাথে হাসে
        সে সাগর-স্রোতে ভাসে,
সে উদাস মনে ব'সে থাকে জংলা পথের পাশে। . . . .
ঝরা তারার তীর হানে সে নিশুত রাতের নভে,
ঘুমন্তরে জাগিয়ে সে দেয় বিপুল বজ্র-রবে। . . . .

তার পথের পথিক সাথী,
তার বন্ধু নীরব রাতি,
. . . .
সে চাঁদের আলো, বর্ষা মেঘের জল,
আপনার খুশীতে ঝরে আপনি সে চঞ্চল।
সে চায়না ফুলের মালা, ফুলের মধু চায়,
        সে চায়না তার নাম,
দান দিয়ে সে পালিয়ে বেড়ায় চায়না তাহার দাম।
        অপরূপ সে দুরন্ত,
        মন সদা তার উড়ন্ত!

দেশের জন্য নিজেকে বলিদানের আকাঙ্ক্ষা নজরুলের কিশোর-কবিতায় ক্ষণে ক্ষণেই দৃষ্টিগোচর হয়। ‘হোঁদল কুৎকুতের বিজ্ঞাপন’-এর ঠাট্টা ও বিদ্রূপের মধ্যেও

নজরুল যখন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বিপ্লবী বাদল (বিজয় ও দিনেশ এর সঙ্গী)-এর প্রসঙ্গ টেনে আনেন, তখন স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বা অধীনতার অবসানের জন্য কবির অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয় :

দস্যি ছেলে ভয় করে না চোখ-রাঙানী ভূত-পেরেত,
সতত-চোখী জুজুর খোঁজে বেড়িয়ে বেড়ায় রাত-বিরেত ।.
ডান্‌পিটেরা ঝুলে ঝাপ্‌পুর গ ুলি-ডাণ্ডায় মন্দ খুব !
বাঁদরা-মুখোর ভ্যাম্‌চিয়ে মুখ খিচে বে হদ্দ হুব !
বীর বাদল সে-দেশের তরে প্রাণ দিতে ভাই যে শিখে,
আন্‌বে যে সাত-সাগর-পারের বন্দিনী দেশ-লক্ষ্মীকে !
কেউ যদি ভাই হয় তোমাদের এম্‌নিতর মর্দ্দ ফের,
হোহো ! তাকে পাঠিয়ে দেবো বাচ্ছা হোঁদল কুৎকুতের !

'কিশোর স্বপ্ন' কবিতায় কবি দেশের দুরবস্থাকে তুলনা করেছেন শ্মশানের সঙ্গে :

মা ! এখানে নাই যে জীবন প্রাণের আবীর-খেলা
আপনাকে যে আপনি মোরা হান্‌ছি অবহেলা ।
'স্কুলে যাও, চাকরি কর'
আদর্শ নাই ইহার বড়--
সকালবেলা জেগে ওঠা ঘুমিয়ে সন্ধ্যাবেলা,
দেশ কোথা মা ! এ যে শুধু শ্মশান-শবের মেলা ।

কিশোর-সাহিত্যের পরিমণ্ডলেও নজরুল আবহমান বাংলার চিরসুন্দর প্রকৃতির পূজারী । স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে প্রকৃতির এই জয়গান 'বাঙালি' নজরুলকেই আমাদের সামনে নতুন করে উপস্থিত করে। তাই নজরুলের কিশোর-কবিতা ও নাটকের পাতায় পাতায় দেখি, বটের ছায়া, শালের পাতা, ঝুমকো লতা, গাই-বাছুরের গোয়াল, লাঙ্গল, ঝিঁঝির ডাক, কাঠবেড়ালী, ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, শাপলা-সুঁদি-খোলামকুচি, খইমুড়ি-কড়াই ভাজা, শাঁক-চুন্নি, কুলের আঁচার, ডাঁশা জামরুল, বাবুই পাখির বাসা, কানামাছি, জুজুবুড়ি, কুঁড়োজালি, হুঁকো, আলতা, সিঁথির সিঁদুর আর শ্মশানের শ্যাওড়া গাছের আবহমান বাংলা । *পুতুলের বিয়ে* নাটকে কমলি ও টুলি তাই বলে :

মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান ।
সত্যি ভাই, এক দেশে জন্ম, এক মায়ের সন্তান ।

তাঁর চেতনালোক ও সাহিত্য-আদর্শের সঙ্গে আপোষ না করে শিশু-কিশোর সাহিত্যের পরিমণ্ডলেও কাজী নজরুল ইসলাম প্রাণবন্ত, হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয় এবং একই সঙ্গে ব্যতিক্রমধর্মী ।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল আজীজ আল্-আমান (সম্পাদিত), ১৯৮২	*নজরুল কিশোর-সমগ্র*, কলকাতা : হরফ প্রকাশনী ।
আবদুল কাদির (সম্পাদিত) ১৯৯৬	*নজরুল রচনাবলী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী । প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড ।
কল্যাণী কাজী (সম্পাদিত) ১৪০৫	*শতকথায় নজরুল*, কলকাতা : সাহিত্যম ।
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯৬৭	*শতাব্দীর শিশু সাহিত্য*, কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা. লি. ।
মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত) ১৯৯৭	*নজরুলের নির্বাচিত কিশোর সাহিত্য*, ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট ।
রফিকুল ইসলাম ১৯৭২	*নজরুল জীবনী*, ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
১৯৯৪	*নজরুল - গ্রন্থপঞ্জী ও নজরুল - বিষয়ক* গ্রন্থাবলী । ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট ।
Gopal Haldar 1973	*Kazi Nazrul Islam*. New Delhi : Sahitya Academy.
Karunamaya Goswami 1989	*Kazi Nazrul Islam : A Profile*. Dhaka : Nazrul Institute.